দেশের একতা ও শিক্ষায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ভূমিকা - বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতা

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

প্রাবন্ধীক

দীর্ঘদিনের জাতিয় কংগ্রেসের সভাপতি এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দেশের একতা-অখন্ডতা ও প্রত্যেকের উন্নত শিক্ষার নির্ভেজাল সমর্থক ছিলেন। তিনি আজীবন বিভেদকামী ফ্যাসিবাদ ও অন্ধ সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করেছেন।

একতা হল একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক-রশ্মির একটি উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের বরাবর লেন্সে আপতিত হয়ে, লেন্সের বিপরিত দিকে প্রধান অক্ষের উপরে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হওয়ার ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যে বিন্দুতে আলোক রশ্মিগুলো মিলিত হয় (ফোকাস বিন্দু) সেখানে এক টুকরো কাগজকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। লক্ষ্যণীয়, আলোক রশ্মিগুলো যখন মিলিত হয়নি, তখন কিন্তু তাদের কারও আগুন জ্বালানোর ক্ষমতা ছিল না। এই নতুন কর্যকরি ক্ষমতা উদ্ভাবিত হলো কেবলমাত্র একতার জন্য। একইরূপে মানুষের মধ্যে একতা অনেক সমাজকে, দেশকে অনেক নতুন ক্ষমতা দিতে পারে – করাতে পারে অনেক অসাধ্য সাধন। মৌলানা আজাদ এই জন্য একতার পূজারী ছিলেন। তবে একতা অর্জন করতে হলে, কিছু শর্ত মানতে হয়। মিলিত হওয়ার পূর্বে প্রতিটি আলোক-রশ্মি নিজেদের ধর্ম-স্বাতন্ত্র রক্ষা করেছে, পরস্পর থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। অর্থাৎ, অংশগ্রহনকারিদেরকে সমমর্জাদা নিতে হবে ও নিজেদের মধ্যে সম্মানজনক অবস্থান বজায় রাখতে হবে – নিজেদের মধ্যে কোনোরূপ বিভেদ-বৈষম্য করা যাবে না। প্রত্যেক সদস্য নিজের আত্ম-সম্মান বজায় রেখেই অংশ গ্রহন করবেন। - অনুরূপভাবে, মানুষের মধ্যে একতা স্থাপিত হলে অনেক অসাধ্য সাধন সম্ভব, অনেক জটিল বা বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান সম্ভব। সেই একতা স্থাপনের জন্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে নিজেদের পরিচিতি বা বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দতে হবে না। নিজ নিজ ধর্ম-বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র সম্মানজনকভাবে বজায় রেখেই সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক একতা সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে, রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী কিছু দস্যু এই একতাকে ভেঙে চুড়মার করে দিতে চায়! কারণ, মানুষের একতাকে তারা ভয় পায়। একতার যে অসীম শক্তি তার মোকাবিলা কররা ক্ষমতা কপট শাসকেদের নেই। তাই তারা, একতা যাতে না হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পূর্বশর্ত চাপায়! বলে, সবাই আগে আমার জেরক্স কপি হও, তাহলেই একতা হবে – অন্যথায় নয়। এটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অবাস্তব! কারণ, সৃষ্টিকর্তা প্রতেক মানুষকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন – প্রত্যেকের ডি.এন.এ. আলাদা। তাই, মানুষের কপি-পেস্ট হতে পারে না। এটা শাসকরা বোঝেন বলেই, একতাকে বানচাল করার জন্য এইরূপ অবাস্তব শর্ত দেন! আর ‘সবাইকে আমার মতোই পোশাক পড়তে

হবে, তবেই তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবো, অন্যতায় নয়' – এটা মানুষকে অপমান করা! তাহলে তুমি আমাকে নয়, আমার বাহ্যিক পোশাককে ভালোবাস; সে ভালোবাসা আসল নয়, নকল। আর, নকল ভাউতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। আর, ভাউতাবাজি দিয়ে মহৎ কিছু হয় না। - সে একতার দরকার নেই। তবে, হতাশ হওয়ার কিছু নেই – রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু মানুষ, মানুষের একতা, একতার শক্তি – চিরস্থায়ী। সত্য চিরস্থায়ীর সরণ নেয় – আমরা সত্যের সরণে।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ কিন্তু একতার পক্ষে মনোভাবের অধিকারি। বিখ্যাত সমাজবিদ, টি. রেমন্ট-এর মতে, *"An isolated man is only a figment of imagination."* অর্থাৎ, একক বিচ্ছিন্ন মানুষ বাস্তবে নয় কেবল কল্পনাতেই থাকতে পারে। মানুষ একতাবদ্ধ, সমাজবদ্ধ জীব। জন্মের সময় আমারা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-সহজাত থাকি। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি-সহজাততা কমতে থাকে এবং কৃত্তিমতা বাড়তে থাকে। ছোটোবেলায় বাচ্চারা সব সময় দল বেঁধে খেলতে ভালোবাসে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প-আড্ডা দিতে ভালোবাসে। স্বার্থপরতা, একাকৃত্তের ভূত চেপে বসে বর্ধিত সয়সের কৃত্তিমতায়। অর্থাৎ, একতা নষ্ট করতে কৃত্তিমতার আশ্রয় নিয়ে হয়। আর একা মানুষ দুর্বল – সে যত গুণী বা ধনীই হন না কেন! আবার, দুর্বল মানুষদের শোষণ, শাসন করা খুব সহজ! তাই, শাসকরূপী শোষকরা ছল, বল, কৌশল – সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ – যে কোনোভাবে মানুষের একতা ভেঙে দিতে চায়। কিন্তু, জনদরদী প্রকৃত শাসক /রাজনীতিবিদরা মানুষের একতাকে নিজেদের শক্তি মনে করেন – কারণ তারা মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, শোষণের সঙ্গে নয়। মৌলানা আজাদ এরূপই প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাই, তিনি মানুষের একতা চেয়েছিলেন।

একতার দর্শনের পথিক হতে উচ্চ মন-মানসিকতার অধিকারি হওয়া দরকার। সঙ্কীর্ণ মানসিকতা; ক্ষুদ্র ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী স্বার্থ মাথায় নিয়ে কেউ মানুষের একতার কথা বলতে পারে না। মানুষের জীবন, সমাজ ও মানব সভ্যতার অতি উচ্চ লক্ষ্য, সীমাহীন উৎকর্ষতা অর্জন করার একমাত্র পথ হল মানুষের একতা। সাধারণ মানুষ নিজেকে চিনতে পারে না, নিজের ভিতরের অসীম শক্তি সম্বন্ধে সে অবগত নয়! তাই, নিজেকে সে সাধারণ (ছোটো) মনে করেন। কিন্তু, বাস্তবে সে সাধারণ নয়! মানব-সম্পদ দ্বারাই বাকি সমস্ত সম্পদ সৃষ্টি করা যায়, পরিচালনা করা যায়। অর্থ-সম্পদও মানব-সম্পদ দ্বারাই সৃষ্ট ও ব্যবহৃত। তাই, যে কোনো বৃহৎ বা মহৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থ কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়। মানব সমাজকে মহত্তর উচ্চতায় পৌঁছাতে মানুষের মধ্যে একতার পাশাপাশি যে মূলধণগুলোর দরকার হয়, সেগুলো হল – পরিষ্কার লক্ষ্য, নিজের /নিজেদের উপরে বিশ্বাস, "ভালো সময়"-এর অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত না করে কাজ শুরু করা – যা কিছু সহায়-সম্বল আছে তা নিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোতে শুরু করা, কঠোর পরিশ্রম /চেষ্টা করা, কাজে /চেষ্টায় লেগে থাকা – প্রথম দিকের অভিজ্ঞতাহীনতার ব্যর্থতায় হতাশ না হয়ে আবার

চেষ্টা করা – সফলতা না আসা পর্যন্ত লেগে থাকা, এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ দিক – ঈশ্বরের উপরে ভরসা রাখা যে ঈশ্বর আমাকে সহায়তা করেন। - মৌলানা আজাদ এই দর্শন জানতেন, মানতেন। তাই, তিনি ভারতবাসী ও ভারতীয় সভ্যতাকে এক অতি –উন্নত উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি দেশের সকল মানুষের একতার অতন্দ্র প্রহরী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে জাতিয় কংগ্রেসের সভায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি আল্লাহর ফেরেস্তা এসে কুতুব মিনারের চূড়ায় বসে বলে যে তোমরা এক্ষুণি দেশের স্বাধীনতা পাবে, যদি তোমরা হিন্দু-মুসলিম একতা ভেঙে দাও। তাহলে আমি (আজাদ) বলব যে এই শর্তে দেশের স্বাধীনতা দরকার নেই। কারণ, স্বাধীনতা না পেলে শুধুমাত্র এই দেশের ক্ষতি, কিন্তু মানুষের একতা ভাঙলে সমগ্র মানব-সভ্যতার ক্ষতি।

মৌলানা আজাদের জীবনের আর একটা বৃহৎ কর্মক্ষেত্র ছিল শিক্ষা। শিক্ষা হল বাস্তব জীবনের জন্য প্রশিক্ষণ। প্রশক্ষণ সঠিক না হলে জীবনও সঠিক হতে পারে না – অনেক সময় জীবনধারণও সম্ভব হয় না। যেমন, আজ আমরা যে ভাত, রুটি, কাপড় ইত্যাদি জীবনের অপরিহার্য জিনিসগুলো পায় – কৃষিকার্য্য আবিষ্কারের আগে সেগুলো পেতাম না। আমাদেরকে খুব কষ্ট করেই জীবন-যাপন করতে হতো। কেন পেতাম না? কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসই – মাটি, জল, সূর্যের আলো, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, উষ্ণতা – সবই তো ছিল! সহজ উত্তর হল, সব থাকলেও কীভাবে কৃষিকাজ করতে হয়, সে জ্ঞান বা শিক্ষা আমাদের ছিল না। এরূপ অনেক জিনিসের ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে, উপাদানের অভাব নয়, বরং শিক্ষার অভাবই আমাদের সকল প্রকার অভাবের মূল কারণ। মৌলানা আজাদ সঠিক বুঝেছিলেন যে যথাযথ শিক্ষায় মানুষকে শিক্ষিত করতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই, স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁকেই দেওয়া হয়। পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা বলতে চারটি H (Head বা মস্তিষ্কের বিকাশ, Heart বা হৃদয়ের বিকাশ, Hands বা দক্ষতার বিকাশ এবং Health বা স্বাস্থ্যের বিকাশ)-এর বিকাশ বোঝায়। আবার ১৯৯৬ সালের ডেলোর্স কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার প্রধান চারটি লক্ষ্য নির্ধারিত হয় – জানার জন্য শিক্ষা, কাজ করার দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষা, একসঙ্গে মিলেমিশে বসবাসের জন্য শিক্ষা এবং মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য শিক্ষা। মৌলানা আজাদ দেশবাসীকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া শিশু-দেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার সকল প্রয়োজন পুরোণের যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে গেছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রয়োজনিয়তা পুরোণের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে IIT-গুলোর প্রতিষ্ঠা, জ্ঞান সৃষ্টি ও নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজননিয়তা পুরোণে উচ্চশিক্ষার সুসংহত কাঠানো তৈরি ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে UGC-এর প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্বাধীন দেশের সাধারণ সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজনিয়তার নিরিখে ঢেলে সাজানো – সকল কিছু তারই অক্ষয় কীর্তি।

শিক্ষার উপরোক্ত লক্ষ্যের প্ররিপ্রেক্ষিতে আমাদের বর্তমান শিক্ষা-পাঠ্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করলে হতাশ হতে হয়। চারটে H-এর বিকাশের কথায় যদি ধরা যায়, দেখা যাচ্ছে যে পাঠ্যক্রমের প্রায় পুরোটা জুরেই শুধুমাত্র মস্তিষ্কের বা বুদ্ধির বিকাশের উপাদান রয়েছে – হৃদয়ের বা মানবতার গুণাবলীর বিকাশের উপাদান তুলনায় অতি নগণ্য। ফলস্বরূপ "শিক্ষিত" লোকেরা হৃদয়হীন, মানবতাহীণ, নীতিহীন – স্বার্থপর, সমাজবিরোধী, চোর, দুর্নীতিবাজ ইত্যাদি ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকারক জীব হিসাবে মানুষ ও মানবতার অশেষ ক্ষতি করছে। একইভাবে পাঠ্যক্রমে কাজের দক্ষতা তৈরির উপাদান না থাকায় এরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় ধরে "শিক্ষা" লাভ করেও – "বেকার" বা অকেজো উপাধী নিয়ে পরিবার ও সমাজের বোঝা হচ্ছে। ডেলোর্স প্রতিবেদনে এই শতাব্দীর শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পাঠ্যক্রম বিশ্লেষণ করলেও প্রায় একই রকম তিক্ত পরিণাম পাওয়া যাবে। এই প্রতিবেদনে শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য ছিল – জানার জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের জন্য শিক্ষা। কিন্তু আমাদের শিক্ষা-পাঠ্যক্রমে জ্ঞানের পরিসীমা হয় অসম্পূর্ণ, নতুবা জ্ঞান (সত্য) বিকৃত। শিক্ষা থেকে সবকিছুই মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে – কিন্তু পাঠ্যক্রমে সম্পুর্ণ সত্যকে জানার উপাদান নেই। সেখানে শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পযর্ন্ত সময়কেই জীবন হিসাবে স্বীকার করা হয় – জন্মের আগে কোথায় ছিলাম? মৃত্যুর পরে কোথায় যাবো? – এসব প্রশ্নের উত্তর এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেই! ফলে জীবন-চক্র অসম্পূর্ণই থেকে যায় – ধারণাও। আবার জ্ঞানের পরিধিতে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের ও বস্তুজগতের জ্ঞানকেই রাখা হয়েছে - বিভিন্ন ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার জ্ঞানকে, যেগুলো আমাদের দেশের প্রায় সকল মানুষের জীবন-দর্শনকে হাজার হাজার বছর ধরে প্রভাবিত করে আসছে, পাঠ্যক্রমের চৌহদ্দির বাইরে রাখা হয়েছে! ফলস্বরূপ, পাঠ্যক্রম মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত জ্ঞানগুলোর চর্চা না করায় – শিক্ষাব্যবস্থা থেকে অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে; মানুষের কাছে প্রসঙ্গ হারাচ্ছে। নতুন জাতিয় শিক্ষানীতিতে প্রায় হাজার বছরের ভারতের মধ্যযুগকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে জ্ঞানের সম্পূর্ণতায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে! আবার, অনেক ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রমের জ্ঞান বিকৃতও বটে। পশ্চিম বঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রণিত একাদশ শেণির, *"বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতি"* (পঞ্চম সংস্করণ, এপ্রিল ২০২০) বইটির ৬০ নং পৃষ্ঠায় একটি ডাহা পুকুর চুরির মতো মিথ্যা তথ্য শিক্ষার্থীদের কচি মাথা হাইজাক করার জন্য দেওয়া আছে। বৃটিশ ভারতে *"সংবাদ প্রভাকর"*-এর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত, ১৯৫৭ সালে হিন্দু-মুসলিমের যৌথ অংশগ্রহনে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধের সময় দেশের প্রতি গাদ্দারি করে ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে লিখেছিলেন, *"এই ভারত কিসে রক্ষা হবে ভেবো না মা সে ভাবনা। সেই তাঁতিয়া তোপীর মাথা কেটে আমরা ধরে দেব 'নানা'।"* (সূত্র: কাণপুরের যুদ্ধ জয়, *'গ্রন্থাবলী'*, পৃ.১৩৬)। এরূপ দেশের প্রকাশ্য শত্রুকে দেশভক্ত রূপে চালানো হয়েছে উক্ত পাঠ্যক্রমে, *"বিদেশি রাজশক্তি এবং বিদেশি মনোভাবাপন্ন বাঙালিদের তিনি বিদ্রূপ করেছেন, প্রকাশ করেছেন স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি আন্তরিক মমত্ব;..."* / - এরূপ জচ্ছুরি কী উদ্দেশ্যে?

কাজের দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাও অবহেলিত। এর প্রমাণ হল সমাজে "শিক্ষিত বেকার"-এর ছড়াছড়ি! একজন ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর শিক্ষাব্যবস্থাকে দেওয়ার পরে শিক্ষাব্যবস্থা কোন যুক্তিতে বলতে পারে, "এবার তুমি কোনো কাজের নয়, মানে বেকার!"। এটি শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব ত্রুটি – যার দায় নিরপরাধ শিক্ষার্থীর উপরে চাপানো হয়! বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে মিলেমিশে থাকার লক্ষ্যও অর্জন করতে পারে নি! আমাদের দেশে প্রতিদিন গড়ে তিনটি করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়; ধর্ম, খাদ্যাভাস, পোশাক, ভাষা ইত্যাদির মতো সামাণ্য বিষয়েও মানুষ খুন, অগ্নিসংযোগ –এর মতো নারকীয় নৃশংসতা প্রদর্শনে তৎপর! সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়ানোর ব্যাপারে তথাকথিত 'শিক্ষিত'রাই অগ্রনি! – বলা বাহুল্য, যেহেতু উপরোক্ত কোনো লক্ষ্যই শিক্ষাব্যবস্থা অর্জন করতে পারে নি, তাই চরম লক্ষ্য – মানুষের মতো মানুষ হওয়া, সটাও সম্ভব হয় নি। তাই, ইংরেজদের "কেরানি তৈরির" শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যে ক'জনও চিন্তাবিদ আমরা পেয়েছি – স্বাধীন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কোনো প্রকৃত চিন্তাবিদ তৈরি করতে পারেনি!

পরিশেষে বলতে হয়, প্রকৃত শিক্ষা এবং একতা হল মানবসভ্যতার অতি গুরুত্বপূর্ণ খুঁটি। যে জাতি এই খুঁটি দুটিকে যত মজবুত করবে, ততই প্রগতি করবে।